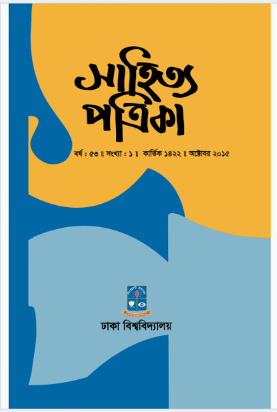

Vol. 53 | No. 1 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে মহামানব ও মুক্তি

Volume	53
Issue	1
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রোকসানা গুলশান
Published online	October 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v53i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i1.2
Pages	১৩-৩৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে মহামানব ও মুক্তি

রোকসানা গুলশান*

বর্তমান সময়ে নানা কারণে পীড়িত আমরা। নিজের একটি সুস্থ সুন্দর সম্মানজনক অবস্থান আমাদের চাই। মানুষ যখন বুঝতে পারে যে সে সুস্থ নয়, তখন সে নিজেই সুস্থতার জন্য বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে পারে। জীব জগতের মধ্যে মানুষই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ আত্মচেতনাসম্পন্ন প্রাণী। তার ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা আছে, কল্পনাশক্তি আছে, আছে অমিত ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছা বা চিন্তা হলো মানুষের সূক্ষ্মতম ও উচ্চতম ক্রিয়া। মানুষই একমাত্র আত্মিক বোধসম্পন্ন প্রাণী। দার্শনিক ফিলালাউসের (৪৭৫ খ্রি. পূ.) মতানুসারে, মানুষের তিনটি আত্মা : উদ্ভিদ-আত্মা, প্রাণী-আত্মা ও চেতনা-আত্মা। 'প্রত্যেক আত্মার উদ্দেশ্য আছে। বিশুদ্ধতায় পৌঁছানোই সকল আত্মার মূল উদ্দেশ্য। উদ্ভিদ-আত্মার উদ্দেশ্য বৃদ্ধি, প্রাণী-আত্মার উদ্দেশ্য চলন এবং চেতনা-আত্মার উদ্দেশ্য ধ্যান। চেতনা-আত্মার বিশুদ্ধতা নির্ভর করে আরও বেশি বিশুদ্ধ কিছু অর্জন করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে' (শহিদুল, ২০০৩ : ২৯)। গভীর সচেতন সাধনাতেই এই শুদ্ধতা আসে। সচেতনতাই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে জাগ্রত রাখে। সচেতন হওয়ার মাত্রার উপর নির্ভর করে মানুষ হিসেবে বাঁচার সার্থকতা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমাদের অধিকাংশই অচেতন, একটুখানি সচেতন মাত্র। আমরা একটা প্রকাণ্ড জড়, তাহারই মধ্যে একরত্তি চেতনা বাস করিতেছে। আত্মার নিদ্রাই জড়ত্ব এবং জড়ের চেতনাই আত্মার ভাব' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২ : ৩২)। সচেতনতার আরেক অর্থ হতে পারে আলোকচেতনা। এই চেতনাকে নিয়েই মানুষকে পথ চলতে হয়। আমরা শৈশব থেকেই এই সচেতনতাকে নিয়েই পথ চলি। এজন্য শৈশবে শিক্ষারম্ভকালে সর্বপ্রথম শিশু তার নিজের নাম লেখার চেষ্টা করে, পৃথিবীতে তার অবস্থানকে জানাতে চায়। এই সচেতনতার বিস্তার ঘটানোর জন্য আমাদেরকে সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করতে হয়। নাইজেরিয়ার লেখক চিনুয়া আচিবি (১৯৩০-২০১৩) বলেন, 'আমাদের একটি নীতি-আদর্শ থাকতে হবে। যদি নীতি-আদর্শ না থাকে তবে সমাজ ধ্বংস হবে। কাজেই এই কল্পনাদৃষ্টি, নীতি-আদর্শ অথবা যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন তা দরকারি।... প্রত্যেক ব্যক্তিকে জ্ঞান এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই কল্পনাদৃষ্টি অর্জনে সাহায্য করতে হবে' (শহিদুল, ২০১৫ : ৫)।

---

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি আইনউদ্দীন কলেজ, ফরিদপুর।

আভিযাত্রিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশি বছরের জীবনসাধনায় কল্পনাদৃষ্টির সাহায্যেই এগিয়েছেন। তাঁর জীবনমন্ত্র ছিল চরৈবেতি, চরৈবেতি; বা নিত্য অগ্রগতির সাধনা, বৃহৎ মানুষের সাধনা, এই সাধনায় তিনি নিরলসকর্মী। বৃহৎ মানুষ সকলের কাম্য অন্তরের মানুষ। অন্তরের এই বৃহৎ মানুষ 'ব্যক্তিগত মানব'কে অতিক্রম করে মহামানবের ধারণার কাছে নিয়ে যায়। 'সমস্ত মানুষেরই অন্তরে রয়েছে এক মহামানবত্বের প্রেরণা, যা তাকে অনুপ্রাণিত করে শ্রেয়োত্বের পথে, মহত্ত্বের পথে অগ্রসর করে নিয়ে যায়।... মানুষের অন্তর্নিবিষ্ট এই 'মহামানব'কেই (superman) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট' (আনিসুজ্জামান, ১৩৭৫ : ১৯৮)। এ প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন :

> আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট' তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে; তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয়, ও অনেক স্থলে বিকৃত বলেই সব মানুষ আজও মানুষ হয়নি (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২ : ৬২১)।

আলোচ্য প্রবন্ধে গগনচুম্বী প্রতিভা[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেতনায় মহামানব সম্পর্কে ধারণা, কাব্যজীবনে মহামানবত্বের পথে উত্তরণ, আত্মশক্তি বা মুক্তি অর্জন এবং সাধক রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার চেষ্টা করা হবে।

দুই

সত্য, সুন্দর, কল্যাণ ও আনন্দের আজীবন সাধক রবীন্দ্রনাথ। বয়স যত বেড়েছে তাঁর মনের দিগন্তও তত প্রসারিত হয়েছে। 'তিনি যতই অন্ত দিগন্তের দিকে অগ্রসর হয়েছেন ততই তাঁর কাব্যে নবতর সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেছে' (খনা, ১৯৭৮ : ১)। 'জীবনের বাঁকে বাঁকে চিরজাগ্রত কবিমন কৌতূহলী হয়ে তাঁর চিন্তা-চেতনার পথে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করেছে। এক্ষেত্রে বৈষ্ণব লীলাতত্ত্বেরও একটি বিরাট ভূমিকা আছে। এছাড়া তাঁর রচনায় হেনরি বের্গসঁর (১৮৫৯-১৯৪১) গতিতত্ত্ব, হেলেনীয় সৌন্দর্যতত্ত্ব, সুফী কবিদের সহজিয়াতত্ত্ব, প্রভৃতির কমবেশি প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে' (খোন্দকার, ১৪৪৮ : ৩৭)। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চল্লিশ[২] বছর বয়স থেকে সাধকের জীবন যাপন করে গেছেন। 'প্রাপ্ত বয়সে কবির প্রজ্ঞা ক্রমে হয়ে ওঠে দার্শনিক' (বেগম, ২০১৪ : ১০৪)। তাঁর শেষ জীবনে ইতিহাসচেতনা বিজ্ঞানবুদ্ধি, সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা প্রবল হয়। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'সাধারণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লোকের রক্ষণশীলতা বাড়ে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় হয়েছে ঠিক উল্টো, বয়স যত বেড়েছে ততই তিনি

মুক্ত হয়েছেন। যা সাময়িক যা প্রথাগত বা দেশে-কালে আপেক্ষিক, যা লোকান্তরের সংস্কার কিংবা ব্যবহারিক বিধিমাত্র সে সমস্তের ঊর্ধ্বে গেছে তার দৃষ্টি; নীতির চেয়ে সত্যকে বড়ো করে দেখেছেন, রীতির চেয়ে জীবনকে' (প্রভাতকুমার, ১৪১৭ : ২৪৯)।

রবীন্দ্রনাথ জীবনবাদী ছিলেন। 'জীবনকে অস্বীকার করে আঘাত-সংঘাত থেকে দূরে সরে গিয়ে অলৌকিক জগতের কোনো সত্যকে তিনি আকাঙ্ক্ষা করেননি – জীবনকে সহজ এবং সুন্দরভাবে দেখতে চেয়েছেন অনাসক্ত দৃষ্টিতে। এই উদার স্বচ্ছ দৃষ্টিতে জীবনকে দেখা খুব যে সহজ তা নয় – বহুদিনের চেষ্টা এবং সাধনার ফল' (বাসন্তী, ১৩৮৭ : ২২৫)।

প্রাচীন ঋষির[৩] মতো আলোকপ্রত্যাশী রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের দুটি মূল বিষয় হলো মুক্তি ও আনন্দ। মানুষকে মুক্তি পেতে হবে এবং মুক্তি দিতে হবে। আত্মশক্তি সাধনায় বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, মনে-হৃদয়ে-ব্যবহারে মনুষ্যত্বের সকল বিভাগেই যাঁরা সম্পূর্ণ সত্য হতে পারে তারাই মুক্তিকে চিনতে পারে। মুক্তি অর্জনের মাধ্যমেই সত্য পথ পাওয়া যায়। এই সত্য পথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> মানুষ অশ্রান্ত যাত্রা করেছে, আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে মানবলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠা করবার জন্য, আপনার জটিল বাধার থেকে আপনার অন্তরতম সত্যকে উদ্ধার করবার জন্যে, আপনার সেই সত্য যা তার পুঞ্জিত দ্রব্যভারের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত প্রথা মত বিশ্বাসের বড়ো, যার মৃত্যু নেই, যার ক্ষয় নেই (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৫ : ৩৮)।

এই অন্তরসত্য অসীম, অনন্ত। আত্মিক চেতনায় জাগরিত হলেই সেই সত্যকে চেনা যায়, যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চেতনাকে সমৃদ্ধ করতে পারে, বিশুদ্ধ করতে পারে। নিজের মধ্যে সেই বিশুদ্ধ অমিত মানবকে পাওয়াই মানুষের সাধনা। সেই আবিষ্কারের পথেই হেঁটেছেন রবীন্দ্রনাথ। সন্‌জীদা খাতুন বলেন, 'ব্যক্তিমানুষ আপন দেহধর্ম অনুযায়ী চলেও রহস্যজনক উপায়ে সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। এই নিগূঢ় ঐক্যতত্ত্বেই সকল মানুষের পথ মেশে এক মহামানবের পথে। ব্যক্তিমানুষ অন্তরপ্রেরণার বশেই সেই মহামানবের নির্দেশ মান্য করে তারই ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে ধন্য হয়' (সন্‌জীদা, ১৯৯৪ : ১০)।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য সাধনায় একক ব্যক্তির মধ্যে বহুত্বের বোধ সঞ্চারের মধ্য দিয়ে মহৎ মানবিকের আবাহন কামনা করেছেন।

তিন

'একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছু নয়, আমি কবি মাত্র'[৪]। এই ছিল রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর বয়সের উপলব্ধি। কবি, ঋষি, দ্রষ্টা ও স্থিতধী দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়েছিল রেনেসাঁসীয় হিউম্যানিজম বা বাংলার ভাব-বিপ্লবের

মধ্যকালে। 'তিনি একজন উঁচু মাপের রেনেসাঁস মানুষ' (আনিসুজ্জামান, ২০১২ : ২৬৫)। রেনেসাঁসীয় হিউম্যানিজমের মূল কথা হলো– বুদ্ধি, যুক্তি, জীবনমুখিতা এবং মানুষ। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই 'মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বরানুভূতি, মূলত এই তিনের সমষ্টিই রবীন্দ্রনাথ' (সুলতান, ২০০৮ : ৮২)। মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাসের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' 'কিন্তু আধুনিক যুগের কবি রবীন্দ্রনাথ শিল্প-সাহিত্যের সাধনায় শুধু মানুষের অস্তিত্বকে গুরুত্ব দেননি, মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তাকেও জানার চেষ্টা করেছেন' (খোন্দকার, ১৪১৮ : ৪০)। তাই মহাকালের যোগ্য উত্তরাধিকার এই লোকায়ত গুণসম্পন্ন সামাজিক মহৎ মানুষই তাঁর কাব্যভাবনার মূল।

সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের মতে, 'রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদের এবং রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার মূল কথাও তাই মানুষ। সর্বমানব এবং ব্যক্তিমানব দুই-ই। প্রত্যেক ব্যক্তি অনন্য, প্রত্যেক অনন্য ব্যক্তিকে নিয়েই সর্বমানব। বাস্তব জীবনের অসংখ্য সম্পর্কের মধ্যেই ব্যক্তির বিকাশ। তারই নাম মুক্তি। তারই নাম যুক্তি' (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৩৮৯ : ১৩৯)।

'মানুষ প্রকৃতির নিয়মের অংশ' (আনিসুজ্জামান, ২০১২ : ১৮৩)। বিশ্ব প্রকৃতি নিয়তই প্রগতিশীল, তাই মানুষকেও সেই অনুপ্রেরণায় হতে হয় প্রগতিশীল, সৃষ্টিশীল। যে মানুষ অহংমুক্ত আত্মার অধিকারী হয়ে মানবতাবোধের সত্য ও সুন্দর শিখাকে প্রজ্বলিত করে, সেই মহৎ আত্মার সান্নিধ্য পৃথিবী চায়। এ এক সাধক মানুষ, ভাবুক মানুষ। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রশান্ত সাধক মানুষের সন্ধান করেছেন।

জীবনে দুঃখ পরম শক্তি। রবীন্দ্রনাথও তাঁর জীবনের একান্ত সকল 'দুঃখের প্রদীপ' জ্বালিয়ে আপন অন্তরকে সংবৃত করে প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছেন। ব্যক্তিগত সকল দুর্যোগে 'জীবনযন্ত্রণাময় ছিন্ন ভিন্ন ঘরোয়া মানুষেরই প্রতিরূপ রবীন্দ্রনাথ, অতিমানব নন, তবে সকল সংকটের কেন্দ্রে বা প্রান্তে দাঁড়িয়েও বারবার জেগে উঠবার চেষ্টা করেছেন' (সিরাজ, ২০১০ : ৪৮)। এই জাগরণের জন্য ভেতরের শক্তির পাশাপাশি 'প্রাচীন উপনিষদের নান্দনিক (Aesthetic) অংশটি তাঁকে প্রাণিত করেছিল; আর তার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া ঘটিয়েছিল উনিশ শতকের ইংল্যান্ডের মিল-বেন্থামের উপযোগবাদী দর্শন, ব্যক্তি-স্বাধীনতা তত্ত্ব' (বেগম, ২০১৪ : ৩)। তাই তিনি জীবনের বিপন্ন সময়ে উচ্চারণ করতে পেরেছেন :

> বধে-বন্ধনে আঘাতে-অপমানে দারিদ্র্যে-দুর্যোগে, হে রুদ্র তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি জীবনকে মহিমান্বিত করিয়া তুলে। তখন দুঃখ এবং মৃত্যু, বিঘ্ন এবং বিপদ প্রবল সংঘাতের দ্বারা তোমার প্রচণ্ড আনন্দভেরী ধ্বনিত করিয়া আমাদের সমস্ত চিত্তকে জাগরিত করিয়া দেয় (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৪ : ৭৮)।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই জাগরণ একদিনের ঘটনা নয়, কালের প্রেক্ষাপটে ধীরে ধীরে তিনি সাধনসমৃদ্ধ হয়েছেন। তাই আমরা দেখতে পাই,"'প্রভাতসঙ্গীত' থেকে 'শেষ

লেখা'য় 'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার' পর্যন্ত সর্বত্রই মানবাত্মার মুক্তি চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে" (তুষারকণা, ১৯৮৫ : ১৪)।

প্রভাতসঙ্গীতে (১২৯০) 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর জাগরণকে কবির কেন্দ্রীয় জীবনতত্ত্ব মনে করা হয়। তিনি বলেছেন,

এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে– প্রাণ হয়ে আছে ভোর।
কী জানি কি হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান। ('নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' *প্রভাতসঙ্গীত)*

রবীন্দ্রনাথ এই উপলব্ধির ইতিহাস দিয়েছেন; 'জীবনস্মৃতি' 'মানুষের ধর্ম', 'মানবসত্য' প্রভৃতি প্রবন্ধে এবং অন্যত্র। 'রবীন্দ্রনাথের এই জাগরণ শুধু তাঁর কবিসত্তারই জাগরণ নয়, এ জাগরণ তার সমগ্র জীবনের এমনকি অস্তিত্বের' (ভবতোষ, ১৯৯৮ : ৯)।

এই জাগরণের চেতনায় তাঁর অধীর মন নিজের সীমারেখা ছেড়ে বিশ্বে ছড়িয়ে যাবার প্রত্যয় ঘোষণা করে। 'জার্মান দার্শনিক ফিক্‌টে (Ficthte) বলেছেন যে, মানবসত্তা সতত নিজের সীমাকে উত্তীর্ণ হইতে বৃহত্তর হইবার সাধনা করিতেছে। সেই ভাবটি '*প্রভাতসঙ্গীত*' রচনার যুগ হইতে কবির অন্তরে প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছিল' (চারুচন্দ্র, ১৪১৯ : ১৩৪)।

এ প্রসঙ্গে বেগম আকতার কামাল রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি* সম্পর্কিত প্রসঙ্গ-কথায় বলেছেন, '*প্রভাতসংগীত* আরেকভাবে রবীন্দ্রনাথের দিব্যদৃষ্টির উন্মিলনে ভাস্বর – যাকে নন্দনশাস্ত্রে বলা হয় এপিফ্যানি – আকস্মিক দিব্যস্পর্শলাভের ক্ষণ' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৫ : ১৯৪)।

মৈত্রেয়ী দেবী বলেছেন :

> বালকবয়সে সেই প্রত্যুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কবির জীবনে মহামানবের আহ্বান শুনিয়ে দিল। নির্ঝর যেমন সমুদ্রের আহ্বানে তার পাথরের কারাগার ভেঙে চলে, তেমনি ক্ষুদ্র আমিত্বের জড়তা ও স্বার্থের কারাগার ভেঙে কবির জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্পর্শে সমৃদ্ধ হতে হতে মহামানব সাগরে মিশবার জন্য ব্যাকুল হল (মৈত্রেয়ী, ২০০২ : ১৪১)।

সন্ধ্যাসংগীত (১২৮৮) এর মাতৃগর্ভের অন্ধকার ভেদ করে এই আত্ম-আবিষ্কারের নাম দেয়া যেতে পারে আলোকপরিচয়। 'এজন্য রবীন্দ্রনাথের আলোকচেতনার অপর নাম মানবচেতনা বা মানবসম্পর্ক; এই সত্যের সূত্রেই বিরহব্যাকুল রোম্যান্টিকতা থেকেও তিনি একটু দূরে সরে যান– প্রবেশ করেন জীবন নিয়ন্ত্রিত দর্শনে' (সিরাজ, ২০১০ : ২৭)। তাঁর দেশকালাতীত জীবনদর্শনের কেন্দ্রে ছিল মানুষ। মানুষের ভেতরের অমৃত

সত্তার আহ্বান তিনি শুনতে পান। তাঁর নিজের ভেতরে এবং সকল মানুষের মধ্যে অবস্থিত 'আদর্শ সত্তা'; 'আদর্শ মানব', 'পূর্ণ মানব', 'চিরকালের মানুষ', 'মহামানব', 'সকল মানুষের মানুষ', 'বিশ্বমানব'কে উপলব্ধি করেছেন আরো পরে।

চার

সোনার তরী (১২৯৮-১৩০০) থেকে রবীন্দ্রকাব্যে একটি নতুন স্রোতের আরম্ভ, যা সমুদ্রসংগম পর্যন্ত প্রবাহিত। এ সময় রবীন্দ্রনাথ জমিদারি তদারক উপলক্ষে বাংলাদেশের শিলাইদহ, পতিসর, শাজাদপুর, প্রভৃতি গ্রামে আনন্দময় অবকাশ কাটিয়েছেন। পদ্মা নদীর প্রাকৃত সৌন্দর্য ও গতিশীলতা, বাউলের সুর, সাধারণ মানুষ ও অবারিত সবুজের সান্নিধ্যে তিনি এক নতুন জীবনসত্যকে আবিষ্কার করেছিলেন। *সোনার তরী*র প্রথম বিখ্যাত নাম কবিতায় কবি নিজস্ব কণ্ঠস্বরে বলেছেন, 'মানুষ পৃথিবীতে কর্মময় জীবন যাপন করে এবং প্রত্যেক মানুষ তার জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে কিছু না কিছু দেয়' (সৈয়দ, ২০১৪ : ৩৪)।

এই কাব্যের শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় কবি এক বিশেষ আহ্বান উপলব্ধি করলেও তিনি 'বুঝে উঠতে পারছেন না যে, কার আহ্বানে এবং কোন আশায় বা বিশেষ প্রত্যাশায় তিনি রাত্রিদিন কর্মের ভার টেনে চলেছেন' (সৈয়দ, ২০১৪ : ৪৫)।

> কোথা আছো ওগো করহ পরশ নিকটে আসি
> কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না নীরব হাসি। (নিরুদ্দেশ যাত্রা, *সোনার তরী*)

এরপরে *চিত্রা* (১৩০২) কাব্যে কবি সেই প্রেরণাদায়িনী সৃষ্টিশীল শক্তিকে চিহ্নিত করেছেন 'জীবনদেবতা' নামে। জীবনদেবতা হলো অর্ধনারীশ্বর সৃষ্টিশীল সত্তা। মনস্তত্ত্ববিদ কার্ল গুস্তাভ য়ুং যাকে 'অ্যানিমাস ও অ্যানিমা সত্তা'[৬] নামে ব্যাখ্যা করেন। এই সত্তা বা 'জীবনদেবতা' তাঁর অস্তিত্ব থেকে চৈতন্যে উত্তরণেরও চালিকাশক্তি' (বেগম, ২০১৪ : ৬)। রবীন্দ্রনাথ এ-সময়ের একটি চিঠিতে বলেছেন, 'নিজের ভিতরকার এই অপার রহস্যের কথা মনে করলে ভারি ভয় হয়– কী করতে পারব না-পারব কিছুই জোর করে বলতে পারিনে – মনে হয় কিছুই না জেনে আমি এ কী একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড সর্বদাই স্কন্ধে বহন করে নিয়ে বেড়াই– আয়ত্তও করতে পারি নে, অথচ এর হাতও কিছুতেই এড়াতে পারি নে – জানি নে এ আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, আমিই বা একে কোথায় নিয়ে যাব–' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১১ : ১৮১)।

প্রাথমিকভাবে *চিত্রায়* আবিষ্কৃত 'জীবন দেবতাই তাকে সমগ্র মানবজীবনের রহস্য উদঘাটিত করে দেখিয়ে দিচ্ছেন' (তুষারকণা, ১৯৮৫ : ৮৯)।

সেই রহস্য উন্মোচনের বিস্ময়ে কবি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছেন। এই চলার পথই তাঁকে বিরাট মানবাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে মহামানবের ধারণায় নিয়ে যাবে। 'কবির

জীবনদেবতা সকল প্রতিকূলতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে কবিকে নিয়ে যান বিশ্বমানবের দিকে, সেখানেই ব্যক্তির সফলতা নিহিত। এ কাজটি ঘটে 'সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদ দ্বারা', কারণ ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আরামের শয্যাতল থেকে ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মধ্যে যে বিপর্যয়, তেমনি বেদনা সেই বিশ্বমানবের সঙ্গে একীভূত হওয়ার কঠিন সাধনায়' (বেগম, ২০১৪ : ৬)। বিশ্বজীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় বলেছেন :

তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। (এবার ফিরাও মোরে , *চিত্রা*)

এ সময় কবি বিশ্ববোধে জাগরিত হয়ে জেনে গেছেন, 'মানুষের দায়, মহামানবের দায়, কোথাও যার সীমা নেই' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৩: ১৫)।

মহাজীবনের পথে এই যাত্রারম্ভে 'কবি আপন কবি চৈতন্যকে বিহঙ্গের সঙ্গে তুলনা করেছেন' (সৈয়দ, ২০১৪ : ১০৩)। *কল্পনা* (১৩০৭) কাব্যের প্রারম্ভে তাই সেই বিহঙ্গের একাকী অজানা যাত্রা প্রসঙ্গে বলেছেন :

যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোর না পাখা। (দুঃসময়, *কল্পনা*, ১৫ বৈশাখ, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা)

এরপর *ক্ষণিকার* (১৯০০) ক্ষণকালীন সুখ-উৎসবের ক্ষুদ্র বৃত্তে কিছুকাল বাধা পড়লেও তিনি ক্ষণিক পরেই *নৈবেদ্য* (১৯০১)-তে এসে অনুভব করলেন, 'সংসারের শতকর্মের বন্ধনের মধ্যে তো আমাদের জীবন। সেই বন্ধনের মধ্যেই বিধাতার গরিমা প্রকাশিত হোক '(সৈয়দ, ২০১৪ : ১৩৫)।

মঙ্গলময়ের কাছে তিনি পরিত্রাণ চাইছেন:

সহস্রের পদপ্রান্ত তলে বারম্বার
মনুষ্য মর্যাদাগর্ব চির পরিহার–
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে

চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গলপ্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে, উন্মুক্ত বাতাসে॥ (ত্রাণ, *নৈবেদ্য*)

নৈবেদ্য তাই আত্মশুদ্ধি ও আত্মনিবেদনের কাব্য। এতে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ আদর্শের অনুসন্ধান করেছেন; কবি বলেছেন, 'করো মোরে সম্মানিত নব বীর-বেশে,/ দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর/ বেদনায়।' সংকটের অনিবার্যতায় সংযমসাধনে, সত্যসাধনার কথা বারবার বলেছেন। এ কাব্যে 'সর্বদেশে সর্বকালে সর্বমানবের হৃদয়ে বিরাজিত মহামানবের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন ঈশ্বরের পদধ্বনির ভিতর' (তুষারকণা, ১৯৮৫ : ১০৯)।

জীবনের বৃহৎ পরিসরে অগ্রগামী হয়ে এরপরে অখণ্ড মানবতাকে উপলব্ধি করেছেন।

গীতাঞ্জলি পর্বে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ গানেরই ভেতরে আত্মপরিচয়কে জানলেন। নিঃসংশয়ে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে কবি সেই সর্বকালীন মহামানব বা বিশ্বমানবের পথে নিজেকে যুক্ত করে নিলেন। রচনা করলেন, *গীতাঞ্জলি* (১৩১৭, ১৯১০) *গীতিমাল্য* (১৩২১; ১৯১৪) ও *গীতালি* (১৩২৩; ১৯১৬)। মানুষ অসীমের চিরসাথী। অহমিকা দ্বারা পূর্ণ মানুষ অসীম তথা পরমানন্দের সাথে মিলিত হতে পারে না। "'গীতাঞ্জলি'র প্রথম গানে ছিল এই বেদনা' (শঙ্খ, ২০১৪ : ৭২)।

নিজের করিতে গৌরব দান
নিজের কেবলই করি অপমান
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে। (গীতাঞ্জলি, ১ সংখ্যক কবিতা)

"গীতাখ্য বই-তিনটির মধ্য দিয়ে তাঁর কেবল এই ঘেরটিকে খুলে ফেলবার আয়োজন, আর সেই আয়োজনের কয়েকটি স্তর পেরিয়ে আসার মধ্য দিয়ে কবি শেষ পর্যন্ত পৌঁছন 'গীতালি'র শেষ কবিতায়, যেখানে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন তাঁর তীর্থদেবতার কাছে। এই তীর্থ কেবল ভারততীর্থ নয় আর, এ তাঁর ধরণীতীর্থ, যেখানে দাঁড়িয়ে আজ কবি বলতে পারেন 'আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম।' আমি-র সঙ্গে সকল-এর যে যৌগিকতাকে বলা যায় রবীন্দ্র ভাবনার কেন্দ্র, এইখানে এসে সেই বোধ যেন পূর্ণভাবে আয়ত্ত হলো তাঁর, আর সেই সাধনারই গানে তিনি ভরে তুললেন 'গীতাঞ্জলি' থেকে 'গীতালি'" (শঙ্খ, ২০১৪ : ৭২)।

১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর রবীন্দ্রনাথ আরো স্পষ্ট করে বৃহৎ বৃত্তের সাথে সম্বন্ধ অনুভব করেছেন। 'নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙালি নন, তিনি ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক' (নিত্যপ্রিয়, ২০০৩ : ১৪৭)।

জীবন সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে তাঁর মনোভাবে তাই আরো পরিবর্তন এলো। একটি বিশেষ গণ্ডি অতিক্রম করে বিশ্ব-সৌরভে সংযুক্ত করতে তিনি জানিয়েছেন :

তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মানুষ
আপনার মহৎ স্বরূপকে দেখেছে কালে কালে,
কখনো নীল-মহানদীর তীরে,
কখনো পারস্য সাগরের কূলে,
কখনো হিমাদ্রিগিরিতটে-
বলেছে 'জেনেছি আমরা অমৃতের পুত্র'
বলেছে 'দেখেছি অন্ধকারের পার হতে আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষের আবির্ভাব'। (*পত্রপুট*, ১০ সংখ্যক কবিতা, শান্তিনিকেতন, ১৯৩৫)

এই দার্শনিক উপলব্ধিতে 'অমৃতের পুত্র' মানুষ তাঁর কবিতায় মানবিক মর্যাদায় অসাধারণরূপে প্রকাশিত হয়। যেখানে 'আকবর বাদশার সঙ্গে/ হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নাই' (বাঁশি, *পরিশেষ*, ২৫ আষাঢ়, ১৯৩৯)। *শ্যামলী'র* (১৩৪৩, ১৯৩৬) 'আমি' কবিতায় আরো জানিয়েছেন :

আমার মন হয়েছে পুলকিত
বিশ্ব-আমি রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি, পাতে নিয়ে রঙ। (আমি, শ্যামলী)

এরপর *সেঁজুতি* কাব্যে অনুভব করলেন, 'মানুষের আত্মা যে জন্ম-মৃত্যু-জরা সবকিছুর উর্ধ্বে আনন্দস্বরূপ চৈতন্যময় অনাদি সত্তা' (বাসন্তী, ১৩৮৭ : ২২৬)। এই আত্মার উন্নয়ন ও মুক্তি রবীন্দ্রনাথ কামনা করেছেন। এভাবে আশাবাদী ও ইতিবাচক মনোভাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ক্রম-বিবর্তন ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার মাধ্যমে মানুষের জীবনের সকল দ্বন্দ্ব, অকল্যাণ, জীর্ণতা, ও মালিন্য প্রভৃতি অতিক্রম করার কথা জানিয়েছেন। কারণ 'মানুষের জীবন সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে কখনও আবদ্ধ নয়, মানুষের জীবন ক্ষুদ্র ইচ্ছার মধ্যে কখনও সীমাবদ্ধ নয়। সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করাই মানুষের জীবনের লক্ষ্য' (সৈয়দ, ২০১৪ : ১৫৩)।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিবৈচিত্র্যে জীবনবোধের সামগ্রিকতার গভীরতা, তাঁর জীবনবীক্ষা ও বিশ্ববীক্ষা তাঁকে তাই 'বিশ্বকবি', 'কবিগুরু', 'চিরআধুনিক' উপাধির সমোপযুক্ত করেছে।

পাঁচ

রবীন্দ্রনাথের আছে দুটো আমি, 'ছোট আমি' এবং 'বড় আমি'। 'রবীন্দ্রনাথের, 'আমিত্ব তত্ত্ব' অর্থাৎ 'ছোট আমি' যাকে কবি 'অহংপূর্ণ আমি' এবং 'বড় আমি' যাকে কবি

অহংমুক্ত আমি' বলে অভিহিত করেছেন' (সুলতান, ২০০৮ : ৪২)। সুফী দর্শনের 'নফসে আম্মারা'র[৭] সাথে অহং বা 'ছোট আমি'র মিল আছে। তাঁর মতে,'আমাদের মধ্যে দুটো আমি আছে, দুটো মানুষ, একজন লোভে ক্ষোভে শোকে দুঃখে আনন্দে বিষাদে সর্বদাই দোদুল্যমান, সে স্থির, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, অথচ ঢাকা পড়ে থাকে সেই বড় সত্তাটাই। এরই বিষয়ে আমি বলেছি, মানুষের দুটো রূপ, একটা তার বিশেষ রূপ, আর একটা তার বিশ্ব রূপ। সেই বিশ্ব রূপেই সে অসীমের সঙ্গে এক' (মৈত্রেয়ী, ২০১৩ : ১৬২)।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের দুটি জগৎকে 'অহং' ও 'আত্মা' নামে অভিহিত করেছেন। 'প্রদীপের সঙ্গে একটিকে তুলনা করা যায়, আর একটিকে শিখার সঙ্গে' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৩ : ৩৩)। দার্শনিক সক্রেটিসের (৪৭০ খ্রি. পূ.) মতে, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকব এবং দেহের সীমাবদ্ধতা আত্মাকে সংক্রমিত করে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান ও সত্য লাভের সাধনায় যেমন উন্নীত হতে পারব না তেমনি সফলতাও অর্জন করতে পারব না' (প্লেটো, ২০০৪ : ১৪১)। তাই প্রকৃত দার্শনিক তথা মহামানবের সাধনার একমাত্র বিষয় দেহ থেকে আত্মার মুক্তি। এতেই মনুষ্যত্ব। 'পুষ্পের পক্ষে পুষ্পত্ব যত সহজ, মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব তত সহজ নহে' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৪ : ২২)। অহংপূর্ণ আমিকে নিয়ে চললে মনুষ্যত্ব পীড়িত হয়, মৃত্যু ভয় দেখায়, দুঃখ শোক তখন একান্ত হয়ে ওঠে। অহংমুক্ত আমি বা আত্মার আলোকিত পথে উত্তরণের জন্য মানুষকে পার হতে হয় অনেক দুঃখ, বিপদ মৃত্যু ও শোক। 'ছোট আমি' বা অহংকে রবীন্দ্রনাথ 'খণ্ডাকাশ' এর সাথেও তুলনা করেছেন :

> অহং যেন খণ্ডাকাশ, ঘরের মধ্যেকার আকাশ যা নিয়ে বিষয়কর্ম, মামলা-মকদ্দমা এই সব। সেই আকাশের সঙ্গে যুক্ত মহাকাশ, যা নিয়ে বৈষয়িকতা নেই : সেই আকাশ অসীম বিশ্বব্যাপী। বিশ্বব্যাপী আকাশে ও খণ্ডাকাশে যে ভেদ, অহং আর আত্মার মধ্যেও সেই ভেদ। মানবত্ব বলতে যে বিরাট পুরুষ তিনি আমার খণ্ডাকাশের মধ্যেও আছেন। আমারই মধ্যে দুটো দিক আছে– এক আমাতেই বদ্ধ আর এক – সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুই-ই যুক্ত এবং এই উভয়কে মিলিয়েই আমার পরিপূর্ণ সত্তা। তাই বলেছি যখন আমরা অহংকে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরি তখন আমরা মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি। সেই মহামানব, সেই বিরাট পুরুষ যিনি আমার মধ্যে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে তখন ঘটে বিচ্ছেদ (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৩ : ৫৪)।

তাই অহমিকা দ্বারা পূর্ণ 'ছোট আমি' পরম সুন্দরের সাথে মিলিত হতে পারে না, যা 'বড় আমি' পারে। মানুষের 'বড় আমি'র এই আত্মা যা কিনা 'কুলের চেয়ে গ্রামের চেয়ে, দেশের চেয়ে, সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বড়ো' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৯৪)। সেই মহান আত্মা 'যিনি জরামৃত্যু শোক, ক্ষুধাতৃষ্ণায় অতীত, যিনি সত্যকাম সত্য সংকল্প তাকে অন্বেষণ করতে হবে, তাঁকে জানতে হবে (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২ : ৬৪৩)। এ

কারণেই তিনি বলেছেন, 'আত্মানং বিদ্ধি– আত্মাকে জানো' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৯০)। এই আত্মার আলোয় ধনবান মহামানবের অন্তর। যে আত্মা শুধু দিতে চায়, নিতে চায় না কিছু, সে সত্যকে পায়, সৃষ্টিশীল আত্মার সেই শ্রেষ্ঠ সাধনার কথাই বলছেন তিনি।

'মানুষের মধ্যে স্বার্থগত আমির চেয়ে বড়ো আমি, সেই আমির সঙ্গে সকলের ঐক্য, তার কর্ম সকলের কর্ম। একলা আমির কর্মই বন্ধন, সকল আমির কর্ম মুক্তি। এই প্রত্যয়ে স্থিত থেকে রবীন্দ্রনাথ সকল কর্ম, তাঁর আদর্শবাদী আত্যন্তিকতা, সর্ববিধ বৈপ্লবিক সংগ্রাম এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক চিন্তা একটি বিন্দুতে সংহতি লাভ করেছিলো' (বিশ্বজিৎ, ২০১৪ : ২০২)।

সে হলো মানুষ এবং তারই মুক্তির বন্ধুর পথ।

ছয়

আজীবন মুক্তির সাধক রবীন্দ্রনাথ *জীবনস্মৃতি* (১৯১১) তে উল্লেখ করেছেন, 'আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৫ : ১৫৯)।

নিজেকে স্পষ্ট করে পাওয়ার নামই সীমা। অর্থাৎ আমি যা তা-ই আমার সীমা। এমনি সীমাবদ্ধ করে চিনতে পারলেই সীমার সিংহাসনের অধিকারী হওয়া যায়। এতেই মানুষ জড়তামুক্ত হয়। মহৎ ও উদার হয়ে আনন্দের রাজত্ব করতে পারে।

> পাখি যখন ওড়ে তখন সে সুন্দর দেখিতে হয়, কারণ তাহার ওড়ার মধ্যে দ্বিধা নাই, তাহা সুনিয়ত, অর্থাৎ তাহা আপনার নিশ্চিত সীমাকে পাইয়াছে। এই সীমাকে পাওয়াই সৃষ্টি অর্থাৎ সত্য, এবং সীমার দ্বারা অসীমকে পাওয়াই সৌন্দর্য অর্থাৎ আনন্দ।... যে ব্যক্তি নিজেকে পাইয়াছে তার আর জড়তার মধ্যে পড়িয়া থাকিবার জো নাই; সে আপনার কাজ পাইয়াছে। নদীর মতো যে বিনা দ্বিধায় আপনার বেগে আপনিই চলিতে থাকে; তাহার সত্য সীমাই সত্য পরিণামের দিকে তাহাকে সহজে চালনা করিয়া লইয়া যায় (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১৬৭)।

কিন্তু আমরা আমাদের রিপু, অহম এসব instinct দ্বারা এতটাই নিমজ্জিত থাকি যে, এই সহজ সত্যকে আমরা সহজে দেখতে পাই না। আমাদের নিজস্ব সত্তাকে চিনতে পারি না। 'সব মানুষই instinct নিয়ে জন্মায়। সবার ভিতরেই থাকে কামনা, ইচ্ছে ক্ষুধার অন্ন– এই অন্ন দেহমন দুই-ই চায়। মানুষের ভিতরে অনেকরকম পশুবৃত্তি আছে যা নির্মল নয়, অথচ প্রবল। যারা ভালো তারা চায় সেই instinct টাকে জয় করতে। ...এখানেই দরকার হয় শিক্ষার। শিক্ষার দ্বারা instinct কে মার্জিত সুন্দর সুসভ্য করা

যায়। instinct কে মার্জিত করেই সাধক, মুনি সাধু হতে পেরেছে' (প্রভাতকুমার, ১৪১৭ : ২৭৩)।

মানুষ একইসাথে মৃন্ময় এবং চিন্ময়। তার মাটির পাত্রেই অমৃতের সুধা আছে। যেহেতু পাত্রটি মাটির, তাই সচেতনতা দরকার। একই দেহের দুই 'আমি' নানা ভোগত্যাগের মধ্য দিয়ে জীবনে সত্য হয়ে ওঠার কথাই রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন,

> জীবনে একটিমাত্র কথা ভাবিবার আছে, যে আমি সত্য হইব, আমি কবি হইব কি কর্মী হইব কি আর কিছু হইব, সেটা নিতান্তই ব্যর্থ চিন্তা। সত্য হইব এ কথায় অর্থই এই, কোথায় আমার সীমা সেটা নিশ্চিতরূপে অবধাবন করিব (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১৬৩)।

আমাদের অহমবোধ জীবনের এই সত্য সাধনায় বড়ো বাধাস্বরূপ। তারা আমাদের তপস্যায় কেবলই বাধা দিয়ে বলতে থাকে; 'তুমি যাহা তুমি তাহার চেয়ে আরো বেশি অথবা অন্য কিছু' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১৬৩)। এজন্যই পৃথিবীতে এত হানাহানি, বিদ্বেষ, কাড়াকাড়ি, দুঃখ ও অমঙ্গল। এই 'অহংটাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো চোর। সে স্বয়ং ভগবানের সামগ্রীও নিজের বলিয়া দাবি করিতে কুণ্ঠিত হয় না' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২ : ১৪৯)।

অহং এর এই অশান্তিতে শান্তি সরে যায় দূরে। শান্তি বা প্রসন্নতাই আনন্দ। আমাদের সাধনা হবে নিজের সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশকে উপলব্ধি করা। এতেই সত্যকে পাওয়া যায়, মুক্তির আনন্দে।

আন্তর্জাতিকতাবাদী রেনেসাঁস আত্মা গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২) বলেছেন, 'মুক্তিই মানুষের মূল সাধনা এবং সে সাধনার সামনে জাতিতে জাতিতে ভেদের সীমারেখা লোপ পেতে বাধ্য' (কবির, ২০০৮ : ২৬)। মানুষকে মুক্তি পেতে হবে দুইভাবে– ভেতর আর বাইরে থেকে। ভেতরের অহং ও অভ্যাসের বন্ধন থেকে এবং বাইরের পদ খ্যাতি, ক্ষমতা বিত্ত ইত্যাদির মোহ থেকে। ভেতর থেকে মুক্তি অহংমুক্ত আত্মার উদ্বোধনকে রবীন্দ্রনাথ 'নবজাতক' বলে অভিহিত করেছেন। "আজকের নবজাতকই হয়তো আগামীর শুকতারা; এজন্য মানুষের উপরই বিশ্বাস রাখতে হবে। 'মানবের শিশু বারে বারে আনে/ চির আশ্বাস বাণী–/ নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো/ বুঝি বা দিতেছে আনি।"(সিরাজ, ২০১০ : ৯৪)।

মানুষ মুক্তির আলোর পথের যাত্রী। তাই জীবনের জড়তা ও বাধা বিপত্তিতে সাহসী হবার সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হবে। ফরাসী দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রের (১৯০৫-১৯৮০) মতে, 'ব্যক্তি সঙ্কটমুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেকেই উন্মোচিত করে– নিজের বিকাশ ঘটায়। পরিস্থিতিই মানুষকে বিশেষ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হয়,

সে ১. পরিস্থিতির ওপর প্রভুত্ব করবে নয়ত ২. সে পরিস্থিতির দাস হবে' (বীতশোক, ২০০৯ : ৫৫)। তাই একই ব্যক্তির সামনে খোলা থাকে দুটি পথ একটি ক্ষুদ্রতার, অন্যটি বৃহতের। 'মানুষ যেহেতু বৃহতের অনুষঙ্গী তাই মানুষকে স্থান-কাল-পাত্রের সকল সংকীর্ণতাকে পরিহার করে অসীমের পথে অগ্রসর হবার প্রেরণা প্রদান করেছেন' (শচীন, ১৯৬২ : ১৩৯)। কারণ মানুষ 'অসীম লোকেরই বাসিন্দা এবং বিশেষ কালের গর্ভে জন্মিলেও মানুষ সর্বকালব্যাপী এ মহামানবসত্তারই নামান্তর মাত্র।... তাই মহাকাল তথা অরূপ সত্তার যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে মানুষকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যভাবনার মধ্য দিয়ে এই প্রেরণা প্রদান করেছেন যে, মানুষ অহংকারমুক্ত আত্মার অধিকারী রূপে বিশ্বময় মানবতাবোধ জাগ্রত করে সত্য ও সুন্দরের অম্লান শিখাকে প্রজ্জ্বলিত করুক' (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৩৮৯ : ১৬৩)।

> 'শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি
> শরমের ডালি' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৩ : ৭০)।

রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন; 'আমাদের কাছে আমাদের প্রতিদিনের সংসারটা ঠিক সামঞ্জস্যময় নয়– তার কোনো তুচ্ছ অংশ হয়তো অপরিমিত বড়ো, ক্ষুধাতৃষ্ণা ঝগড়াঝাঁটি আরামব্যারাম টুকিটাকি খুঁটিনাটি খিটিমিটি এইগুলিই প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তকে কণ্টকিত করে তুলছে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১১ : ৩০৬)।

তাই আমরা একটি সামঞ্জস্যময় সমগ্রতার বোধের কাছে পৌঁছাতে চাই। "প্রতিদিনের ছোটো ছোটো সেই গ্লানির মধ্যে ঘুরে বেড়াই, ক্লীব হয়ে আসে মন, মনে হয় যেন 'সর্ব অঙ্গে মাখা ছিল মলিনতা', নিজেকে ঘিরে ঘিরে ঘুরবার ক্লান্তিতে ছেয়ে যাই, যখন জানি যে 'সত্য মুদে আছে' আমাদেরই দ্বিধার মাঝখানে, তখনই একবার আত্মকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে পড়বার ইচ্ছে হয় জগতের আনন্দযজ্ঞে, তখন আমাদের সবারই মনে হয়, 'আমার আমি ধুয়ে মুছে তোমার মধ্যে যাবে ঘুচে'। ভালেরি তখন লিখতে পারেন 'সেই হলো জাগরণ'" (শঙ্খ, ২০১৪ : ৩০)।

এই জাগরণেই মানুষ নিজের গভীর ভেতরে এক সম্পূর্ণতার বোধ অনুভব করে। এই সমগ্রতার বোধে পৌঁছেই মানুষ মিলে যায় আরেক মানুষে।

সাত

মহামানব আজকালের মানুষ নয়। এ হলো সত্য মানুষ, সবার হৃদয়ের মানুষ, আলোর মানুষ। মহাকালের গতিকে যিনি করে তোলেন প্রগতিশীল। তিনি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের মানুষ। 'সমস্ত মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে যিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৩ :৫৬)।

চিরকালের ভাবুক এই মহামানবকে রবীন্দ্রনাথ 'মানবব্রহ্ম'ও বলেছেন। 'উপনিষদের ব্রহ্ম নয়, রক্ত-মাংসের বাস্তব মানুষও নয় সে হলো রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, ইতিহাসের মানুষ– মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শ' (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৩৮৯ : ১৪৪)।

প্রমথনাথ বিশী তাঁর ব্যাখ্যায় বলেছেন :

> মহামানব বলিতে কখনো তিনি বুঝিয়েছেন পরমাত্মন, কখনো বুঝিয়েছেন বুদ্ধের মত মহাপুরুষে যাহার আংশিক বিকাশ। এই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব দেশ ও কালের সংস্কার অতিক্রম করে– ইহার মধ্যে একটা বিশ্বজনীনতার ভাব আছে, ইহাকেই কখনো কখনো তিনি Universal Man অভিহিত করিয়াছেন। আবার কখনো তিনি ইতিহাসান্তর্গত মনুষ্য প্রবাহকেও মহামানব আখ্যা দিয়েছেন (প্রমথনাথ, ১৩৭৪ : ৩৫৩)।

রবীন্দ্রনাথ যেহেতু নিজের দেশ ও সময়কে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, তাই তাঁকে মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শের কথা ভাবতেই হয়।

তাই তাঁর রচনায় মানবের নানা মাত্রাকে দেখিয়েছেন :

> সে মাত্রার প্রথমটিকে তিনি বলেছিলেন, 'চিরমানব'। অসংখ্য মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে মানবসত্তা অপরাজিত এবং অপরাজেয় তাই চিরমানব।... এই চিরমানবসত্তার সিংহাসনে বসেই তিনি মানুষের নানা অমানুষিক প্রবণতার মাঝখানে মানুষের মধ্যে তার আর একটি মাত্রা পূর্ণতার আভাসকে লক্ষ্য করেছেন। যাঁদের জীবনে সেই আভাস পেয়েছেন, তাঁদেরই তিনি বলেছেন 'মহাত্মা', 'মহাপুরুষ', বা 'মহামানব'। রবীন্দ্রনাথ কার্লাইলের 'হিরো অ্যান্ড ওয়রশিপ' বই থেকে মহামানবের সংজ্ঞার্থ তুলে ধরেছেন। 'কার্লাইল বলেছেন, বস্তু জগতের অন্তরতর রাজ্যে সত্য, শাশ্বত এবং অনন্তের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন যিনি, তিনিই হিরো অর্থাৎ মহামানব। এই সত্য, শাশ্বত বা অনন্ত সকলের অগোচরেই নিতান্ত তুচ্ছ ও ক্ষণিক ব্যাপারের আড়ালেই লুকিয়ে আছে। সেই অন্তররাজ্যেই মহামানবের গতিবিধি কাজে বা কথায় তিনি সেই অন্তররাজ্যেই প্রকাশ করেছেন। এই অন্তররাজ্যে পৌঁছালে মানুষের দেশ-কাল-জাত-পাত গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের সীমা ভেঙ্গে যায়। মধ্যযুগের সাধু-সন্ত থেকে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর এবং এ-যুগের গান্ধীজী এবং অন্যদিকে 'মানবধর্মী' বুদ্ধ আর খ্রীস্ট– বিশেষ করে এঁদেরই জীবন, কর্মোদ্যোগ বা সৃষ্টিকর্মের পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনথের মনে হয়েছে এঁরাই প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তররাজ্যে পৌঁছে খণ্ডিত মানুষের সীমা ভেঙেছেন (উজ্জ্বল, ১৪০০ : ৫১)।

শঙ্খ ঘোষ বলেছেন : 'আমার এক আমি প্রতি মুহূর্তে নিজেকে জুড়ে রেখেছে প্রতিদিনের সঙ্গে, ইতিহাসের সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে। আমার আরেক আমি আছে মহাসময়ের শূন্যতায়। এই দুয়ের মধ্যে আছে দীর্ঘ এক যোগরেখা, যে রেখা কখনো

আবছা হয়ে আছে আবার কখনো যা খুলে যায় কোন উদ্‌ভাসে' (শঙ্খ, ২০১৪ : ৫০)।

এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।
সর্ব মানুষের মাঝে
এক চির মানবের আনন্দ কিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকীরিত। (আরোগ্য, ৩৩ সংখ্যক কবিতা)

মুহূর্তের 'আমি'র আবরণ খসে গিয়ে চৈতন্যের জ্যোতিতে স্পষ্ট আমি হলো চিরমানব। তার চিত্তে যে আনন্দের বন্যা, এই আনন্দকিরণের আরেক নাম 'ওমেগা'[৯] বা 'ভালোবাসা'। এ ভালোবাসায় মানুষ পূর্ণতা পায়। আত্মনির্মাণে নিজেকে বাড়িয়ে নিতে পারে বিশ্ব পরিধিতে। 'ধর্ম যেমন মানুষকে তার অহংসীমার বাইরে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়, ভালোবাসারও তো সেই কাজ' (শঙ্খ, ২০১৪ : ৩৫)। "শিলার লিখেছিলেন, 'আমরা সকলেই আমাদের মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছি এক আদর্শ মানুষের সম্ভাবনাকে, মানবসত্তায় এক আর্কেটাইপকে, আর তাই আমাদের সকলেরই দায়িত্ব হলো সমস্ত প্রতিরোধ অতিক্রম করে সেই আর্কেটাইপের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা' " (শঙ্খ, ২০১৪ : ৭৪)।

সেই মহামহিমের দিকে কঠোর সাধনায় রবীন্দ্রনাথ এগিয়েছেন। কারণ দুঃখের দহনেই বিশুদ্ধতার কাছে পৌঁছানো যায়।

ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়ো সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি। (এবার ফিরাও মোরে, *চিত্রা*)

'নদী যেমন সমুদ্র হতে হতে সমুদ্রকে পায় তেমনি তিনি ব্যক্তিগত মানুষ থেকে উত্তরোত্তর মহামানব হওয়ার দ্বারাই বিশ্বমানবের সত্তা উদ্ভাসিত করেছেন আমাদের জ্ঞানে' (মৈত্রেয়ী, ২০০২ : ১৪৬)। মহামানব তিনিই, যিনি মানবধর্মের ব্যাকুল বোধে মনুষ্যত্বকে মুক্তি দিতে পারেন। সে এক আত্মত্যাগী মহাপ্রাণ মহাত্মা, যিনি মৈত্রীর সাধনায় যুক্ত মুক্ত মানুষ। প্রতিটি মানুষ এই মহামানবকে ধারণ করে। যিনি কোনো ঈশ্বর নন, অতিমানব নন। এ হলো আমার আমি-র মূল কেন্দ্র।

কাজী নজরুল ইসলাম সেই সম্ভাবনাময় মানুষেরই কথা বলেছেন কবিতায়:

হেস না বন্ধু! আমার আমি সে কত অতল অসীম,
আমিই কি জানি, কে জানে কে আছে আমাতে মহামহিম। (মানুষ, *সাম্যবাদী*)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় গানে সেই আমি-র দিকে ছুটে গেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে ওঠে আত্মজাগরণের গান। নিজেকে রচনা করবার গান।

আট

ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে ।
সুরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন ।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলি তলে হয়ে গেল ভগ্ন ।
উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে ।
'জয় জয় রে মানব অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে । (*শেষলেখা*, ৬ সংখ্যক কবিতা, উদয়ন, শান্তিনিকেতন, ১ বৈশাখ)

এই গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আশি বছর পূর্ণ হবার চব্বিশ দিন আগে শান্তিনিকেতনে নববর্ষ উৎসবের জন্য লিখেছিলেন । 'ইহাই কবির রচিত শেষ সংগীত' (নীহাররঞ্জন, ১৩৬৯ : ২৪২) । গানটি রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্যের[১০] অন্তর্গত, এবং *শেষলেখা*[১১]-এর ৬ (ছয়) সংখ্যক কবিতা । এই কাব্যগ্রন্থের 'কিছু কবিতা স্বহস্তে লিখেছেন, কিছু শয্যায় থেকে মুখে মুখে রচিত । আর এ কারণে কথার পর কথা সাজিয়ে প্রাজ্ঞ কবি অন্তিম শয়নে শিল্পমাত্রার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করলেন কবিতাকে । ছন্দের সকল বন্ধন ছিঁড়ে, সুরের রেশ ফেলে দিয়ে কথার মালা সাজিয়ে পৌঁছে গেছেন জীবনের গূঢ়তত্ত্বে । সেখানে মহামানবের আবির্ভাবের মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে' (সৌরভ, ২০০১ : ৩৫) । কবির জীবনের শেষ ভাষণ জন্মোৎসবের ভাষণ 'সভ্যতার সংকট' (১৩৪৮, জ্যৈষ্ঠ)-এর শেষে 'ঐ মহামানব আসে' গানটির উল্লেখ আছে । 'এতে দুই মহাযুদ্ধে নির্বাপিত প্রায় মনুষ্যত্বের ভস্মস্তূপে দেখতে পেয়েছিলেন চিরমানবকে' (আবু, ১৯৯৫ : ১২৪) ।

১৯৪১ সালের এই সময়টা ছিল অস্থির । বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের[১২] দামামায় মানবতাবাদ প্রায় বিলুপ্ত । সেসময় বিদায় নেবার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ মানবতাবাদের মহান বিজয় কামনায় দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারণ করেছেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' । মানবতা হলো সেই মহাসমুদ্র, সাময়িক অশুভ প্রভাবে যার কিছু অংশ দূষিত হলেও তাতে সমগ্র সমুদ্রের কিছুই হয় না । কারণ মানবতা অপরাজেয় । সভ্যতার এ সংকট মুহূর্তে তাঁর আশাবাদ ছিল :

> আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই।... মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবো। আশা করবো, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎমর্যাদা ফিরে পাবার পথে (রবীন্দ্রনাথ, ২০০২ : ১৮০)।

মহাযুদ্ধের মনুষ্যত্বহীন বিপর্যস্ত সময়ে তিনি একেবারে হতোদ্যম হয়ে পড়েননি, তিনি মানুষের প্রতিই আস্থা রেখেছেন। *জন্মদিনে* (১৯৪১/মে, ১৩৪৮/বৈশাখ) কাব্যগ্রন্থে আত্মবিস্মৃত না হয়ে কবি ইতিহাসের চিরস্মরণীয় সেই মৃত্যুঞ্জয় প্রাণের কথা স্মরণ করেছেন :

> নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
> যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে
> যারা অন্যমনা, তারা শোনো
> আপনারে ভুলো না কখনো।
> মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ
> সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ
> তাহাদের মাঝে যেন হয়
> তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
> তাহাদের খর্ব কর যদি
> খর্বতার অপমানে বন্দি হয়ে রবে নিরবধি।
> তাদের সম্মানে মান দিয়ো
> বিশ্বে যারা চির স্মরণীয়। (*জন্মদিনে*, ১৮ সংখ্যক কবিতা)

মানুষের অন্তর্নিহিত মহিমার প্রতি আস্থাশীল কবি, পূর্বসূরী মহাত্মাগণের পথ অনুসরণ করার কথা বলার পাশাপাশি পরবর্তী মহৎ আত্মার পদধ্বনির ঘোষণাও শুনিয়েছেন:

> এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান,
> বীভৎস তাণ্ডবে
> এ পাপযুগের অন্ত হবে,
> মানব তপস্বী বেশে
> চিতাভস্ম শয্যাতলে এসে

নবসৃষ্টি-ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে–
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান। (জন্মদিনে, ২১ সংখ্যক কবিতা)

এই মানবতপস্বীবেশী অনির্বাণ মানবমহিমার চূড়ান্ত আগমন সংবাদ তিনি জানিয়েছেন তাঁর শেষ গানে, 'ঐ মহামানব আসে'। 'এই মহামানব ব্যক্তিমানব নয়, নবচেতনায় জাগরিত নব মানব' (হুমায়ুন, ১৯৯৯ : ১০৫)। এ হলো 'অখণ্ড চিন্ময় মানবসত্তা' (ভবতোষ, ১৯৯৮ : ২৩)। যাঁরা ইতিবাচকবোধে নতুন চেতনায় জাগ্রত। যাঁরা মৃত্যুকে, মৃত্যুভয়কে জয় করেছে। যাঁরা যুগের প্রয়োজনে পরিবর্তিত সত্য পরিস্থিতিতে আত্মশক্তি অটুট রেখে চলতে জানে। মানুষের কল্যাণ সাধনে যারা অগ্রগামী। এ প্রসঙ্গে ড. খনা মুখোপাধ্যায় বলেছেন :

> মানব তাঁর দৃষ্টিতে মহৎ এবং বৃহৎ। তাই মানবের চিরন্তন মহিমার প্রতি তাঁর যেমন অবিচল বিশ্বাস, তেমনি মহামানবের আগমনের সম্ভাবনার প্রতিও তিনি নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের কথা তিনি একেবারে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছেন। যে মানব চিরন্তন মানবতার আদর্শকে পরিপূর্ণ বিকাশ করতে চেয়েছেন, দেশকালের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে সর্ব মানবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, এবং যিনি বিশ্বমানবে বিশ্বপ্রেমে যুক্ত করার প্রয়াসী হয়েছেন তিনিই মহামানব। এই মানবের আগমনেই প্রকৃত মুক্তি আসবে। পৃথিবীতে বিভেদ-বিচ্ছেদ দূরীভূত হবে। তবে রবীন্দ্রনাথের কাছে এই মুক্তি কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক অর্থে মুক্তি নয়, এই মুক্তি নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক। কবির বিশ্বাস নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মুক্তিতেই দুঃখ-দুর্দশার অবসান সম্ভব (খনা, ১৯৭৮ : ১০০)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো অতিমানববাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী। সেই আত্মশক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটবে পূর্ব দিগন্ত হতে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। যাঁরা অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্বতোভাবে ব্যবহার করে আত্মপ্রতিষ্ঠিত।

নয়

আত্মশক্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা এক ধৈর্যময় সাধনার নাম। নিজেকে নিজের থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনা এ। এটাই মানুষের সবচেয়ে বড়ো সৌন্দর্যময় পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ 'মনে করেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আত্মশক্তি অপেক্ষা উন্নততর আর কিছু নেই' (হুমায়ুন, ২০০০ : ৫১)।

'এ আত্মশক্তি নিজের ভিতরে নিজেকে খুঁজে বেড়ায়। তৈরি হয়ে ওঠে এক প্যারাডক্স, কেননা যতই সে ভিতরে যায় ততই সে বেরিয়ে আসে বাইরে। যতই সে বুঝতে পারে তার পরিচয়, ততই সে মুক্ত হয় অহংকার থেকে, তার গণ্ডি থেকে। যতই সে তার

আমিকে পায়, ততই সে যুক্ত হয়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী এক না-আমির সঙ্গে, আর সেইটেকেই বলি মুক্তি' (শঙ্খ, ২০১৪ : ৭৪)।

আত্মশক্তির এই জেগে ওঠাকে রবীন্দ্রনাথ মুক্তিমন্ত্র ভেবেছেন। 'সে কেবল কোনো ব্যক্তির মুক্তি নয়, সে হলো জাতির মুক্তি, এমনকী মানুষের মুক্তি। আত্মশক্তির এই জেগে ওঠাই হলো তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো মানুষের ধর্ম' (শঙ্খ, ২০১৪ : ৭৫)। আত্মশক্তিকে সংগঠিত করে ব্যক্তি তথা জাতি সংস্কৃত হতে পারে। সংস্কৃতি যেহেতু মানবীয় ব্যাপার তাই মানুষই পারে নিজের ও পরিবেশের সংস্কার সাধন করতে। কারণ 'সংস্কৃতির মর্মে আছে উন্নত হওয়ার ও উন্নত করার এবং সুন্দর হওয়ার ও সুন্দর করার প্রবণতা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা' (আবুল, ১৪১৬ : ৩)। আত্মশক্তি জাগ্রত করার মাধ্যমেই আমরা আমাদের ক্ষমতাকে বুঝতে পারি। 'রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন, মানুষের আত্মশক্তি জাগ্রত করতে হবে, অর্থাৎ এখনকার ভাষায় যাকে আমরা বলি ক্ষমতায়ন' (আনিসুজ্জামান, ২০১২ : ২৩১)। আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায়, এতেই মুক্তি।

দশ

আধুনিক বাংলা কবিতার অঙ্গনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব এক যুগান্তর। 'জগতের মধ্যে যা কিছু সুন্দর ও প্রাণস্ফূর্ত, রবীন্দ্রকাব্যে তার প্রকাশ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অক্লান্ত ও অনবচ্ছিন্ন (আবু, ১৯৯৫ : ৩৮)। 'কতো বিচিত্র উপাদান দিয়ে ষাট বছরের অক্লান্ত সাধনায় গড়ে উঠেছিলো রবীন্দ্রকাব্যের রাজপ্রাসাদ' (আবু, ১৯৯৫ : ৩৬)। তাঁর প্রগতিশীল মন নদীর গতিপ্রবাহের মতো অগ্রগামী। মালেকা বেগম বলেছেন, যখনই বদলানো প্রয়োজন বোধ করেছেন, তখনই নিজের চিন্তাধারাকে রবীন্দ্রনাথ বদলেছেন। তিনি সেটা স্বীকার করেছেন। এখানেই তিনি মহৎ মানুষ, এখানেই তার মনুষ্যত্বের দায় যে, তিনি লুকিয়ে রাখেননি তাঁর চিন্তা, আদর্শ, মতামত' (আনিসুজ্জামান, ২০১২ : ১৭৬)।

শেষ জীবনে তিনি নিজের অপূর্ণ জীবনকে বিরাট মানব জীবন প্রবাহের অংশ রূপে উপলব্ধি করেছেন। এক্ষেত্রে বিশ্বমানবের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে নিজের জম্মদিনের উৎসব ও মানুষের জম্মদিনকে একীভূত করে পয়লা বৈশাখে[১৩] পালন করেছেন।

> বহু জম্মদিনে গাঁথা আমার জীবন
>
> দেখিলাম আপনারে বিচিত্র রূপের সমাবেশে। (*জন্মদিনে*, ২ সংখ্যক কবিতা)

'রবীন্দ্রনাথের সতত নিরীক্ষাশীল কবিপ্রতিভা বারবার তাঁর জীবনচেতনায় পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তনের সেই ইতিহাস ধারণ করে আছে তার কবিতা' (বিশ্বজিৎ, ২০১৪ :

২০১)

আজীবন নিরলসকর্মী 'রবীন্দ্রনাথের ত্রিবিধ যোগ, ধ্যানযোগ, সৃষ্টিযোগ ও কর্মযোগ। ধ্যানযোগ যা তিনি উপলব্ধি করেন সাহিত্য ও সঙ্গীত ও চিত্রে তা সৃষ্টি হয়ে ওঠে এবং যখন সামাজিক সাংসারিক জাগতিক হিতৈষায় সক্রিয় কার্যক্রমে তা বাস্তবে সম্পন্ন করেন তখন তাই হয়ে ওঠে কর্ম' (মুহম্মদ, ২০১৪ : ৩০)।

মানুষ অনন্ত, তাঁর মানসে আছে ক্রমনির্ভর অনন্ত ঈশ্বর। এই মানুষ অপূর্ণ, পূর্ণতার দিকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। অস্তিবাদী দার্শনিকের মতে, 'কোন মানুষ যেহেতু পূর্ণ নয়, সুতরাং পূর্ণতার প্রতি তার একটা স্বভাবসুলভ প্রবণতা আছে।... মানুষ প্রকৃত মানুষ হতে চায়। সার্ত্রের মতে, প্রকৃত মানুষই ঈশ্বর' (বীতশোক, ২০০৯ : ১৪৭)।

মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য বিশুদ্ধতায় পৌছানো। 'শুদ্ধতার প্রসঙ্গেই অন্তরতম গ্রাহ্য; এই শুদ্ধতা আসে গভীরতর দহন বা সাধনার দ্বারা' (সিরাজ, ১৪২২ : ৬১)। প্রত্যেক মানুষের ভেতরে এই বিশুদ্ধ সত্তাটি সুপ্ত থাকে। 'যেমন করিয়া হোক নিজের গর্তটার ভিতর হইতে নিজের নির্মল বিশুদ্ধ সত্তাটিকে বাহির করিয়া আনিতেই হইবে' (প্রভাতকুমার, ১৪১৭ : ৩১১)।

এজন্য ইচ্ছাই যথেষ্ট। স্রষ্টা প্রত্যেক মানুষকে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পার্থক্য বা বিশেষত্ব দান করেছেন। "ইচ্ছাটাই বুঝি সবচেয়ে জাজ্বল্যমান আমি সবচেয়ে কী চাই তাহাই বুঝি সবচেয়ে আমার কাছে সুস্পষ্ট – কিন্তু সেটা ভ্রম। আমার যথার্থ ইচ্ছা আমার অগোচর। অগোচরে থাকিবার একটা কারণ আছে-সেই ইচ্ছাই আমাকে নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। ...আমার সবচেয়ে সত্য ইচ্ছা, নিত্য ইচ্ছা কোনটা? যে ইচ্ছা আমার সার্থকতা সাধনে নিরত। আমার সার্থকতা যতদিন পর্যন্ত রহস্য সেই ইচ্ছাও ততদিন আমার কাছে গুপ্ত। কিসে আমার পেট ভরিবে, আমার নাম হইবে, তাহা বলা শক্ত নয়; কিন্তু 'কিসে আমি সম্পূর্ণ হইব' তাহা পৃথিবীতে কয়জন লোক আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে?" (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৪ : ৪৩)। এ কারণে এই জ্ঞান ও সত্য সাধনায় মানুষকে সযত্ন, সতর্ক ও পরিশীলিত জীবনযাপন করতে হয়। 'মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না' (মোতাহের, ১৯৯৫: ১০২)। মানুষের আত্মা যখন সত্য সাধনায় আনন্দিত হয়, তখনই পূর্ণতা ধরা দেয়। জ্ঞান, প্রেম, কর্ম এর পূর্ণ মিলনে সত্যিকার আনন্দ, যা সত্য সাধনাতেই পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ যে শুদ্ধ আত্মার কথা বলেন, 'সকলের মাঝে তা খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। অন্যদিকে তিনি কর্মীর মতো প্রমাণ করতে চেয়েছেন, ইচ্ছে করলে সম্ভব; 'বিশ্বভারতী-শ্রীনিকেতন কর্মযজ্ঞ তার পরিচয় বহন করে' (সিরাজ, ১৪২২ : ৬৭)।

সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম সত্য মানুষের মধ্যে নিহিত। তাই রবীন্দ্রনাথ "'আমি' নিয়েই 'আমরা'র পথ সন্ধান করেন" (সিরাজ, ১৪২২ : ৬৭)। তিনি তাকিয়ে থাকেন অনাগতকালের সেই পরম মানুষ এর দিকে, 'যখন মানুষ জয় করবে তার পশু স্বভাবকে, অবতার বা মহাপুরুষ নন, ঘরে ঘরে ভূমিষ্ট হবে পূর্ণ পুরুষ, পূর্ণ মনুষ্যত্বের চিরজীবিত আদর্শ (আবু, ১৯৯৫ : ১১১)। কারণ মনুষ্যত্বই মানুষের প্রকৃত ধর্ম। 'যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম' (রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা : ২০১৩)। মনুষ্যত্বকে সহজাতভাবে অর্জন করা যায় না, সাধনা করে পেতে হয়। এই বিকশিত সাধনাই মহামানবের সাধনা। সেই মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত, বিশ্ববোধে উত্তীর্ণ সৃষ্টিশীল কর্মী মানুষই চিরদিনের মহামানব।

এগারো

মানুষ এক অনন্য স্বনির্ভর সত্তা। মহাবিশ্বের বিস্ময়কর এই স্বাধীন সত্তা প্রাণপ্রবাহের ধারায় ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। এই নিখিল বিশ্বের সবকিছুকে গ্রহণ করে, স্রষ্টার সাথে আত্মিক বন্ধনের মাঝেই জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে। জীবনঘনিষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ সে বন্ধনে একনিষ্ঠ থেকে নিজ জীবনে ও মানবজীবনে মহামানবের পীঠস্থান রচনায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। মানুষের দ্বারাই spritual civilization আনা সম্ভব। তাই কবি অনাগতকালের মহামানবের প্রতি আশাবাদী ছিলেন, যারা মানবযাত্রায় অগ্রগতিকে আরো বেগবান করবে। নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখলে তাঁর এই রোম্যান্টিক আশাবাদ মানব অভ্যুদয়ের বাস্তবতা ও সম্ভাবনাকে যদিও প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে। তবু বলা যায় আত্মচেতনায় সজীব প্রাণী মানুষ, প্রতিনিয়ত জীবভাবকে ছাড়িয়ে সৌন্দর্যময় পথ রচনা করে চলেছে। আত্মপ্রসারের তাড়নায় আত্মপ্রকাশ করে চলেছে তার সৃষ্টিশীল কর্মী সত্তা। এই মানুষই মহাজ্যোতির অন্যতম অংশ, আত্মকেন্দ্রিক গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে চৈতন্যের মুক্তিতে মানুষ হয়ে উঠুক সৃজনশীল। সে চৈতন্যের প্রবাহে স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠুক জাগতিক বিশ্বের ভেতর ও বাহির উভয়ই।

মানুষ 'হয়ে ওঠা'র সাধনায় সব সময় ভালো কিছু হয়ে উঠতে চায়। এই সিদ্ধান্তগ্রহণ বৃহৎ মানবসমাজের সাথে সম্পৃক্ত। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে সমগ্র পরিবেশের সাথে আমাদের একটি ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক আছে। তাই আত্মসচেতন মানবসত্তা হিসেবে আমাদের যে কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াটি জরুরি বিষয়। এক একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আলোর মতো অগ্রগামী পথ সৃষ্টি করে। এ কারণে জীবনযাত্রার পথে আমাদের সংকল্পের সিদ্ধান্তগুলো খামখেয়ালিপূর্ণ না হয়ে শিল্পকর্মের মতো নান্দনিক হওয়া চাই। মনুষ্যত্ববোধে জাগ্রত সচেতন প্রাণী হিসেবে আমাদের অনুভব, চিন্তা, বিশ্বাস, আচরণ,

সংকল্প সবকিছুই সময়ের সাথে পরিশীলিত হওয়া চাই। এতেই মুক্তির পথ সহজতর হয়। আমাদের মুক্তির উপরই নির্ভর করে অপরের মুক্তি। বিশ্বানুভব, সৌন্দর্যানুভব ও মানবতাবোধের কবি রবীন্দ্রনাথ সে মুক্তির বারতা শুনিয়েছেন। এ কারণে আমাদের সংকটে ও সম্ভাবনায় এখনো রবীন্দ্রনাথ আলোর দূত। মহামানবের সাধক রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা ও মানবমুক্তি তাই যেন সমার্থক।

তথ্যনির্দেশ

১. 'হাজার বছরের সাধনা ছাড়া কোনো জাতি এমন বিপুল বিশাল কূলপ্লাবী প্রতিভার দেখা পায় না, কোনো-কোনো জাতি দশ হাজার বছরেও পায় না। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙালি মানসের শ্রেষ্ঠ পরিস্ফুটন একথা বললে অবশ্য সত্যের অর্ধেকটা বলা হয়। রবীন্দ্রনাথের ভেতরে পল্লবিত- মঞ্জরিত হয়েছে ভারতীয় তথা প্রাচ্যদেশীয় আত্মাটি, যে আত্মাটিকে ভ্রান্তভাবে, অপূর্ণভাবে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে এডওয়ার্ড সাইদ-নিন্দিত অরিয়েন্টালিস্টরা গত হাজার বছর অন্তত। রবীন্দ্রনাথ সেইসব নিন্দার পরিশীলিত জবাব' (খোন্দকার, ২০১৩ : ১৫৫)।

২. 'জীবনের পঁয়তাল্লিশটি বছর কেটে গেছে দেশ-জাত-ধর্মের খোলসমুক্ত হতে' (আনিসুজ্জামান, ১৩৭৫ : ১৫৩)।

৩. 'ভারতে জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে উৎসর্গের ভঙ্গিতে এবং তা অগ্নিধর্মে পবিত্রতামুখী। ভারতের ঐতিহ্য ঋষির অধ্যাত্মধ্যান ও জ্ঞানচর্চায় প্রতিফলিত। রবীন্দ্রনাথ সেই ঐতিহ্যে সবাইকে আজ আহ্বান জানাতে চান; আহ্বান করে ফিরে আসুক কোনো তরুণ ঋষি, যে সকল প-তর্কের উর্ধ্বে উঠে ডাক দেবে, ভারত ফিরে আসবে তার অগ্নিশুদ্ধতায়' (সিরাজ, ২০১০ : ১৮)।

৪. '১৯৩১ খৃষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে এক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছু নয়। আমি কবি মাত্র। আমি তত্ত্বজ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞানী, গুরু বা নেতা নই – আমি বিচিত্রের দূত [২৫ শে বৈশাখ, ১৩৩৮]' (মনোয়ারা, ১৩৯৮,৮০)।

৫. 'রেনেসাঁসের সময়ে সবাই না-হলেও বিদগ্ধজনেরা প্রকৃতি, ও মানুষ সম্বন্ধে গভীর কৌতূহল, উৎসাহ ও অনুরাগ বোধ করতে আরম্ভ করেন। বলা উচিত পুনরায় আরম্ভ করেন, তাই ঐ যুগের নাম 'রেনেসাঁস' বা পুনরুজ্জীবনের যুগ।... রেনেসাঁসের সময় থেকে ঈশ্বরের স্থান ধীরে ধীরে অধিকার করলো মানুষ এবং প্রকৃতি। অল্প বিস্তর জোয়ার-ভাঁটা সত্ত্বেও এই মানবমুখিনতা ও প্রকৃতিপ্রিয়তা হয়ে দাঁড়ালো য়্যোরোপীয় চিত্তের স্থায়ী মেজাজ' (আবু, ১৯৯৫ : ১৫৩)।

৬. 'প্রতিটি মানুষের মাঝেই তার বিপরীত লিংগের কিছু চরিত্র থাকে। একজন পুরুষের মাঝে থাকে ANIMA বা নারী চরিত্রের উপাদান আবার একজন নারীর মাঝে থাকতে পারে ANIMUS বা পুরুষ চরিত্রের উপাদান। Anima আর Animus থাকার কারণে যৌথ মনস্তত্ত্বে অবস্থান করে আমরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারি' (মঈন, ২০১২ : ৩৮০)।

৭. "পৃথিবীর যাবতীয় আধ্যাত্মিক দর্শন বলে যে অন্যায়, অবিচার, নিষ্ঠুরতা, হত্যা, গণহত্যা, যুদ্ধ প্রভৃতি মানববিরোধী আচরণের মূল কারণ হলো অহংবোধ (ego বা নফস আল-আম্মারা) যা মানুষকে অজ্ঞ করে রাখে তার মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে। অহংবোধে আচ্ছন্ন মানুষ বিস্মৃত হয় যে তার পৃথিবীতে জন্মানোর মূল কারণ ও লক্ষ্য হলো উচ্চ সত্যের (উচ্চ সত্যকে অভিহিত করা হয় আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বর, গড এবং আদি আমেরিকানদের ভাষায় 'গ্রেট স্পিরিট' ইত্যাদি নানা নামে) সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। সংযোগ স্থাপনের দুটি উপাদান হলো প্রেম ও জ্ঞান। যে কোনো সভ্য সমাজের প্রাণশক্তি হিসেবে ওই দুটি উপাদানের প্রয়োগ যখন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয় তখনই সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং বৃদ্ধি পায় অন্যায়-অবিচার, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, লোভ ও লালসা" (শারমিন, ২০১৪ : ১২৯)।

'এক অর্থে মানুষ যখন তার ইগো-অহংবোধ বা নফস আল-আম্মারাকে নিয়ন্ত্রণ করার সংগ্রাম অব্যাহত রাখছে তখন সৃষ্টি হয় শান্তি ও সম্প্রীতি' (শারমিন, ২০১৪ : ৩৩৬)।

৮. ইউরোপের রেনেসাঁস আত্মা জোহান উলফ্‌গ্যাং ফোন গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২)। সামগ্রিক কৃতির দিক থেকে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথকে একমাত্র প্রতীচ্য কবি গ্যেটের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

৯. 'Omega, in which all things converge, is reciprocally that from which all things radicate' (শঙ্খ, ২০১৪: ৩৯)।

১০. 'রবীন্দ্র জীবনের শেষ দশ বছরের কাব্য *পুনশ্চ* থেকে *শেষ লেখা* (১৩৩৯; ১৩৪৮; ১৯৩২-১৯৪১)। এ পর্যায়ের কাব্যকে উত্তরকাব্য বলা হয়– যা বিভিন্ন দিক থেকে পূর্ববর্তী কাব্য অপেক্ষা স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট– কবির দীর্ঘ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সারাৎসার' (মনোয়ারা, ১৩৯৮ : ৭৭)।

১১. *শেষ লেখা* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। এটি প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ সালের ভাদ্র মাসে। এতে পনেরটি কবিতা আছে। রবীন্দ্রনাথ এর নামকরণ করে যেতে পারেননি।

১২. 'রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কাব্যে স্বদেশের সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অশান্তি ছায়াপাত করেছে। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ সর্বাত্মক আকার ধারণ করলে ইংল্যান্ড সে যুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে পড়ে– সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশ ভারতও' (মনোয়ারা, ১৯৯১ : ৮১)।

১৩. 'শেষ জীবনে তিনি পঁচিশে বৈশাখের উৎসবকে পয়লা বৈশাখে পালন করিতেন' (প্রমথনাথ, ১৩৭৪ : ৩৫৫)।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯৯৫)। *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

২. আনিসুজ্জামান [সম্পাদিত] (২০১২)। *রবীন্দ্রনাথ, এই সময়ে*, প্রথমা, ঢাকা।

৩. আনিসুজ্জামান [সম্পাদিত] (১৩৭৫)। *রবীন্দ্রনাথ*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

৪. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার (১৪০০)। *রবীন্দ্রনাথ*, সৃষ্টির উজ্জ্বল স্রোতে, আনন্দ পাবলির্শাস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৫. কাজী নজরুল ইসলাম (২০১০)। *সাম্যবাদী;* আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

৬. খোন্দকার আশরাফ হোসেন (২০১৩)। *বাঙালির দ্বিধা ও রবীন্দ্রনাথ এবং বিবিধ তত্ত্বতালাশ*, নান্দনিক, ঢাকা।

৭. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪১৭)। *রবি রশ্মি*, দেবুক স্টোর, কলকাতা।

৮. ড. খনা মুখোপাধ্যায় (১৯৭৮)। *রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়*, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা।

৯. ড. মো. সুলতান আলী (২০০৮)। *রবীন্দ্রকাব্যে জীবনদর্শন ও মানবতাবোধ*, শকুন্তলা, ঢাকা।

১০. তুষারকণা রায় (১৯৮৫)। *রবীন্দ্রচেতনায় মানবধর্ম*, সমীর পুস্তকালয়, ঢাকা।

১১. নিত্যপ্রিয় ঘোষ (২০০৬)। *স্নেহের ভিখারি*, *এবং মুশায়েরা*, কলকাতা।

১২. নীহাররঞ্জন রায় (১৩৬৯)। *রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ঢাকা।

১৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৪১৭)। *রবীন্দ্রজীবনী*, ২য় ও ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

১৪. প্রমথনাথ বিশী (১৩৭৪)। *রবীন্দ্র সরণী*, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা।

১৫. প্লেটো [ভাষান্তর, সফিউদ্দিন আহমদ] (২০০৪)। *সক্রেটিসের শেষ দিনগুলি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৬. বাসন্তী চক্রবর্তী (১৩৮৭)। *রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য*, ওরিএন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা।

১৭. বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১৪)। *অশেষ রবীন্দ্রনাথ*, নান্দনিক, ঢাকা।

১৮. বীতশোক ভট্টাচার্য, সুবল সামন্ত [সম্পাদিত] (২০০৯)। *জঁা পল সার্ত্র*, *এবং মুশায়েরা*, কলকাতা।

১৯. বেগম আকতার কামাল (২০১৪)। *রবীন্দ্রনাথ যেথায় যত আলো*, অবসর, ঢাকা।

২০. ভবতোষ দত্ত (১৯৯৮)। *রবীন্দ্রচিন্তা চর্চা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

২১. মঙ্গন চৌধুরী (২০১২)। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, নদী পাবলিশিং অ্যান্ড মিডিয়া হাউস, ঢাকা।

২২. মৈত্রেয়ী দেবী (২০০২)। *কুটিরবাসী রবীন্দ্রনাথ*, মুক্তধারা, ঢাকা।

২৩. মৈত্রেয়ী দেবী (২০১৩)। *মংপুতে রবীন্দ্রনাথ*, প্রাইমা পাবলিকেশনস্, কলিকাতা।

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১২)। *রবীন্দ্রসমগ্র*, ১৪, ১৫ খণ্ড, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০২)। *কালান্তর*, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা।

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০৬)। *পথের সঞ্চয়*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৭০)। *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৯৫)। *সঞ্চয়িতা*, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা।
২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১৫)। *জীবনস্মৃতি*, প্রতীক, ঢাকা।
৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১)। *আত্মপরিচয়*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।
৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১৩)। *মানুষের ধর্ম*, বুক ক্লাব, ঢাকা।
৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১৪)। *ধর্ম*, বুক ক্লাব, ঢাকা।
৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১১)। *ছিন্নপত্রাবলী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।
৩৪. শচীন সেন (১৯৬২)। *রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়*, রীডার্স কর্নার, কলিকাতা।
৩৫. শারমিন আহমদ (২০১৪)। *তাজউদ্দীন আহমদ : নেতা ও পিতা*, ঐতিহ্য, ঢাকা।
৩৬. শঙ্খ ঘোষ (২০১৪)। *নির্বাচিত প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ*, কথা প্রকাশ, ঢাকা।
৩৭. সন্‌জীদা খাতুন (১৯৯৪)। *রবীন্দ্রনাথ : বিবিধ সন্ধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
৩৮. সিরাজ সালেকীন (২০১০)। *রবীন্দ্রকাব্যে আলোকভাবনা*, ধ্রুবপদ, ঢাকা।
৩৯. সত্যেন্দ্রনাথ রায় (১৩৮৯)। *রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।
৪০. সৈয়দ আলী আহসান (২০১৪)। *রবীন্দ্র কাব্যপাঠ*, ১ম খণ্ড, মূর্ধন্য, ঢাকা।
৪১. সৈয়দ আবুল মকসুদ [সম্পাদিত] (১৯৯৫)। *মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচনাবলী-১*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৪২. সৌরভ সিকদার (২০০১)। *রবীন্দ্র প্রতিভার নানাদিক*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা।
৪৩. হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৯)। *রবীন্দ্র প্রবন্ধ, রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

প্রবন্ধপঞ্জি

১. খোন্দকার সিরাজুল হক (১৪১৮)। রবীন্দ্রনাথের ধর্মজিজ্ঞাসা, মাসিক *উত্তরাধিকার*, শ্রাবণ ১৪১৮, বাংলা একাডেমি। পৃষ্ঠা ৩৬-৪৩।
২. শহিদুল ইসলাম (২০০৩ / ১৪১০)। বিজ্ঞানের দর্শন : ২, জেডি বার্নালের সমাজ ও বিজ্ঞান ভাবনা, *শিক্ষাবার্তা*। সংখ্যা-১১, পৃষ্ঠা ২৮-৩৬।
৩. সিরাজ সালেকীন (২০১৫)। রবীন্দ্রে পাওয়া সনৎকুমার, *বাংলাদেশের হৃদয় হতে*, সাহিত্য-সংস্কৃতি ত্রৈমাসিক, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা-৩০, জ্যৈষ্ঠ ১৪২২। পৃষ্ঠা : ৬৫-৭৪।
৪. মুহম্মদ নূরুন্নবী (২০১৪)। গ্রাম বাংলার সমতল ভাবনায় বাঙালী রবীন্দ্রনাথ, *বাংলাদেশের হৃদয় হতে*, সাহিত্য-সংস্কৃতি ত্রৈমাসিক, ৭ম বর্ষ, সংখ্যা-২৬, ১৪২১। পৃষ্ঠা : ২৬-৩৩।
৫. মনোয়ারা বেগম (১৩৯৮)। রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের কাব্য : প্রেক্ষাপট ও বৈশিষ্ট্য, *সাহিত্য পত্রিকা*, ৩৫ বর্ষ, সংখ্যা ১, কার্তিক ১৩৯৮। পৃষ্ঠা : ৭৭-৮৪।
৬. শহিদুল জহির [সংগ্রহ ও ভূমিকা পিয়াস মজিদ] (২০১৫)। আত্মপরিচয়ের সীমানা অংকন, কালের খেয়া, *সমকাল*, সংখ্যা- ৪৪৫, ২০ মার্চ, ২০১৫। পৃষ্ঠা : ৪-৫।
৭. আবুল কাশেম ফজলুল হক (১৪১৬)। বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে, *নববর্ষ*, পয়লা বৈশাখ ১৪১৬।